এখানে হিমরাত পুড়ছে বালিরেণু   
তথাপি দূরে কেউ কুয়াশা ছলকায়,   
ব্যথার আদরে এতটা নুন ছিল  
অঘুম কারাবাসে, তবু ঘুম পায়।  
যতটা নিয়ত, ততটা দেওয়া হলে   
প্রাচীরে শৈবাল-অ্যামিবা কথা কয়,  
নদীর কাছ থেকে বিরহ নেওয়া শেষে  
সাগরে গিয়ে বালু-ঝিনুকে প্রেম হয়!  
অন্ধকার কারা গেঁথেছে গোপনে  
বিষের পাশে শুয়ে নীরবে একা একা,   
ঝিনুক ফলে গেলে সাগর মরণে  
খোলসের আবরণে মুক্তা ছিল লেখা।  
এহেন দৃশ্যের পাশেতে শুয়ে শুয়ে  
টুকরো তারাভাঙা ঝরছে—তা–ই দেখা।

রাখো দৃশ্যের মুখোমুখি প্রতিফলক।  
আড়াল ঝরানো পারদের চোখ থেকে   
আবৃত হওয়া ডাক পেল প্রশ্ন রাখে—  
হব নাকি পার?  
গহ্বর ঘিরে রাখে অযুত প্রস্তর।  
মাতাল রোদের স্পর্শে চনমনে বালুর  
গান থেকে মরু–পর্বতের সারিতে  
নেমেছে শ্রান্ত মাধুরী। জুঁইয়ের  
আলুথালু ঘ্রাণ বেয়ে গড়ানো   
সময়ের এলানো শিয়রে  
ঠাঁই পেল অনন্ত অলোক।

জ্যোতিষী বলেছে—  
হাসপাতালে রোগযন্ত্রণায় নয়  
আমার মৃত্যু বরং হবে সাঁড়াশি চুম্বনে; নেশাতুর ওষ্ঠ-অভিসারে  
এক জমকালো সন্ধ্যায় আমাদের দেখা হবে  
অর্থাৎ  
আমি ও আমার যম—চতুর্দিকে নিস্তব্ধ নগরী  
প্রতিটি চুম্বনের আগেই তাই সযত্নে গ্রহণ করি মৃত্যুপ্রস্তুতি  
ও সুবল রে…  
এরে কি চুম্বন বলে, ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যু যেথা যথা ঊহ্য নাহি?

হাওয়ায় কাঁপছে রৌদ্র—সবুজ না হলুদাভ মালাবার, নারকেলগাছের সবুজ।  
ওরা আসে, দূর দ্বীপপুঞ্জের বাণিজ্য জাহাজ।  
আসে মসলাভর্তি।  
আসে জায়ফল, দারুচিনি,   
লবঙ্গ ও বণিকের হঠাৎ বিপন্ন চোখ তল্লাশে কঙ্কাল খুলির নিশান  
মধ্যসাগরে, কুজ্ঝটিকার আড়ালে  
কোথাও কি দুরবিনে চমকাল রোদ? বারুদের গাদায় বসে ভাস্কো দা গামা?  
বণিকেরা মন্ত্র জপে, মনে মনে।  
তবু শুনে নিতে পারে তারা পরস্পরের মন্ত্র:  
যেন তারা সৌরতাপে উবে বাষ্পীভূত হয়ে যাবে,   
যেন তারা জাহাজসমেত মেঘে মিলিয়ে যাবে—  
  তারা অপেক্ষা করে

আয়নার পারদ উঠে গেছে, ও এখন কেবল কাচ; যেন সকালে গোসলভেজা শরীর, অফিসে যাবার আগে শশব্যস্ত, নগ্ন, পরে নিচ্ছে জামাকাপড়; জানি, গ্রিবা ও তারও নিচে ছড়িয়ে থাকা যত পাখি ও পক্ষিবিশারদ, তাদের চোখে গ্লাস-বরফের জল;  
যদি মুখাগ্নির আগুন জ্বলেও ওঠে ঠোঁটে, একঝামটায় নিভিয়ে দেবে সকল উদ্যোগ;

এ শীতে কুয়াশা চিরে আমি হেঁটে যাই  
কুহক ছড়ানো পথে!  
দেখি শীতঘোর রাতে   
যারা বের হয়  
মধুবালা অপেরা হাউস থেকে;  
শিস কেটে হেঁটে যায়   
কুয়াশা মোড়ানো আলপথ ধরে—  
তারা সব হারিয়ে ফেলেছে  
শীতভেজা রঙিন টিকিট!  
হামদহ গ্রামে যে কবি হেঁটে যায়  
হারিকেন নিভে যাওয়া জোনাক আলোতে—  
দূর থেকে ভেসে আসা  
টিয়াডাক ভোরে  
তার দুহাতে জড়ানো দেখি  
শীতঘুম রতির পালক!  
এ শীতে পুরোনো জংশন পার হয়ে  
আমি হেঁটে যাই;  
ধোঁয়া ওঠা চায়ের টংঘর  
ছড়ানো খড়ের গাদা আর  
শীতলাগা মেথরপাড়ার পাশ ঘেঁষে হেঁটে যাই—  
কড়া নাড়ি মাঝরাতে  
শীতমগ্ন দেবীর ডেরায়!

এই চিত্র চিত্র নয়, এই দৃশ্য দৃশ্য কিছু নয়,   
পাত্রে পাত্রে বিচিত্র পসার  
এ বাজারে আজকাল, সরাসরি বর্গিরাও আসে!  
বহু রং কোর্তা পরে রঙে রঙে সেজেছে দোকানি  
দৃশ্যে দৃশ্যে তারা দুখী, মনে মনে খুশি   
তারা চুনের বদলে ধান, তারা পানের বদলে কেনে শাড়ি  
জঙ্গলের প্রতি যত জঙ্গবাজ কিশোরেরা যায়  
মাঝে মাঝে চণ্ডশক্তি ধার করে আনি  
পরিবর্ত-চিন্তা এলে মনে মনে এই সব জাগে  
এ বাজারে বর্গিরাও দাঁত খুলে হাসে

আমাদের চোখ এসে ঢেকে দিচ্ছে প্রজাপতি একদল:  
বিষণ্ন সন্ধ্যায়, বুকশপে এভাবেই চুমু ও চাবুক—  
উঠছে জেগে—সহস্রাব্দ পেরোনো লাল অক্ষরের শোক  
কাটিয়ে পাশ, শহুরে হাওয়া ও ধুলায় করছে খলবল   
খুচরা পয়সার মতো তোমাকে ছিটিয়েছি যতবার  
শহরজুড়ে গজিয়েছে তত জুঁই ফুল গাছ—আহা! আর—  
কাছিমের পিঠ হয়ে উবু শুয়ে থাকা নীল ফ্লাইওভার:  
তাতে বেদনা নিরবধি সেজে অন্ধ রেসিং কার  
উড়িয়েছে শূন্য ঘরে ও বাইরে প্রবল হাহাকার;  
আমাদের চোখ ঢেকে দিয়ে গেছে প্রবোধের নীল পাহাড়  
পাহাড় বলতেই আড়মোড়া দাও তুমি, চিরহরিৎ মাতা:  
পরাধীনতার গল্প জানো কি? বিমূর্ত ভায়োলিন!  
ক্রন্দনময় পর্বত প্রান্তর আমাদের নিজস্ব ফিলিস্তিন:  
বুলেট রচিত প্রেমকাব্যে বিজ্ঞাপনী স্বাধীনতা

যখন এমন শীতরাত আসে, চরাচর স্তব্ধ হয়ে যায়। হঠাৎ কয়েকটি পাতার মর্মর ছড়িয়ে পড়ে বহুদূর। আজ সে রকম শীত। কোথাও কোনো শব্দ নেই বলে এত দূর থেকে ঘুমে ঘুমে আপনার পাশফেরা শোনা গেল। দীর্ঘ গজারিবন আর কুয়াশার রেণু বেয়ে কানে এল শাড়ির খসখস।   
আমি বসে আছি আমার পোষা একমাত্র টিকটিকিটির দিকে তাকিয়ে। রাতভর খাবারের সন্ধানে ছুটল সে, দাঁড়াল, দেয়ালে শুয়ে থাকল মড়ার ভান করে। কিন্তু একবারও বলল না—টিকটিক…।

কুয়াশায় সমাহিত চরাচর  
শীতের গভীর কোনো রাত্রে  
হাতে ধরা কোথাকার উলুখড়  
এসেছি দিগ্​বিদিক হাতড়ে  
বাঁশঝাড়, ধানখেত পেরিয়ে  
হাতে-পায়ে কাদামাখা, ক্লান্ত  
আঁধারের চোরাফাঁদ এড়িয়ে  
যেতে হবে, ডাকে ওই প্রান্ত  
যেন এক পলাতক আসামি  
বহুদিন পরে এল পাড়াতে  
এ বাড়ি কি তার বাড়ি? আয়েশা  
দরজাটা খুলে যদি দাঁড়াতে   
কিন্তু কোথাও কোনো সাড়া নাই  
নিঃসাড় পড়ে আছে চারিধার  
তাহলে কি ফিরে যাব? ফিরে যাই  
এই রাতে আমি কার, কে তোমার…

এখন তো শ্বাস নেওয়াটাও শাস্তি মনে হচ্ছে;  
তাহলে কি মিছিলে আবার যাব একবার আরও—  
এই ধূসরাভ দ্রাঘিষ্ঠ সময়?  
এই বিদায়–সন্ধ্যায়, এই বিবশ অক্ষমতার দিনে,   
এই পায়ে–পায়ে উদাস জড়তার বয়সে?  
আমার মতো অন্য যারা ডায়াবেটিস আর ইনসুলিনের  
দ্বৈরথে দুর্গত, তারাও আজ যেতে চায় মিছিলে।  
যা কিছু ছিল একদা আমাদের গর্বের ধন, তা সব  
লুট হয়ে গেছে আমাদের আলস্যকালে। লুট করে  
নিয়ে গেছে বহুদূরে, অন্য এক শত্রু শহরে। তালার চাবি  
আর হত্যার খঞ্জর আমরাই নাকি তুলে দিয়েছি  
পুরাতন ঘাতকের হাতে।  
চিঠি একটা এসেছিল লাল এক রক্তিম খামে  
সীমান্ত-তারে ঝুলে থাকা ধর্ষিতা ফেলানীর নামে।  
শ্রবন্তী নদীর মতো নাম তার ভুলে গেছে লোকে;  
এখন সে ঘাসে আকীর্ণ গঞ্জের নিচু জমি ছাড়া  
আর কিছু নয়।

যদি আর পাঁচ–সাত বছর বেঁচে থাকেন, তখন ভেবে দেখবেন, কবিতা প্রকাশ করবেন কি করবেন না।  
কবিতায় একদা তিনি লিখেছিলেন, ‘এক পৃথিবী লিখব বলে একটি খাতাও শেষ করিনি!’ পশ্চিমবঙ্গের সেই জনপ্রিয় কবি জয় গোস্বামী এবার দিলেন এক বিস্ময়কর ঘোষণা, এখন থেকে আর কবিতা প্রকাশ করবেন না তিনি। সম্প্রতি নিজের কবিতা প্রকাশের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত কবিতা প্রকাশের ৫০ বছরে নামের এক পুস্তিকায় দীর্ঘ একটি লেখার মাধ্যমে জয় গোস্বামী এ ঘোষণা দিয়েছেন। তবে কবিতা প্রকাশ না করলেও কবিতা লেখা থেকে অবসর নিচ্ছেন না এই খ্যাতিমান কবি। জয় গোস্বামী জানিয়েছেন, এখন থেকে তিনি নীরবে-নিভৃতে লিখে যাবেন। যদি আর পাঁচ–সাত বছর বেঁচে থাকেন, তখন ভেবে দেখবেন, কবিতা প্রকাশ করবেন কি করবেন না।  
কবিতা প্রকাশের ৫০ বছরে পুস্তিকায় জয় গোস্বামী লিখেছেন: ‘আমার ৫০ বছর কবিতা প্রকাশের পূর্তি আমি আমার রচনা প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েই উদ্​যাপন করতে চাই। যেসব সম্পাদক আমার লেখা সম্মান দিয়ে এত বছর প্রকাশ করে এসেছেন, তাঁদের কাছে আমার আভূমি-নত কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি। পাশাপাশি আমার কাছে আর লেখা চেয়ে চিঠি না দেওয়ার অথবা ফোন না করার জন্যও মিনতি জানাই। তাঁদের “না” বলতে আমার দুঃখ হবে, অথচ “না” তো বলতেই হবে আমার আত্মপরীক্ষার জন্য। তাঁরা যে আমাকে দুঃখ দিতে চান না, এ-কথা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি!’  
নিজের এ সিদ্ধান্তকে জয় গোস্বামী ‘আত্মপরীক্ষা’ বলে উল্লেখ করে এখন থেকে কেউ যেন পুরস্কার দেওয়ার জন্য তাঁর নাম বিবেচনা না করেন, এমন অনুরোধও করেছেন।  
জয় গোস্বামী দুবার আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত বজ্রবিদ্যুৎ-ভর্তি খাতা কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কার পান। এ ছাড়া বঙ্গভূষণ, বঙ্গবিভূষণ, সাম্মানিক ডি লিটও লাভ করেছেন দুই বাংলার জনপ্রিয় এই কবি।  
গেল ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের সময় কবিতা প্রকাশের ৫০ বছরে শিরোনামের পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। বিনা মূল্যে পুস্তিকাটি পাওয়া যাচ্ছে কলকাতার বিভিন্ন বইয়ের দোকানে। সেই পুস্তিকায় জয় গোস্বামী আরও লিখেছেন, ‘একটি কবিতার পেছনে সর্বোচ্চ পরিশ্রম প্রয়োগ করার সময় লেখাটি কবে ছাপা হয়ে বেরোবে, এই বাসনাকে বিচ্ছিন্ন করা। যেকোনো বাসনার মধ্যেই একরকম উত্তেজনা থাকে। লেখার উত্তেজনাটি জাগ্রত রইল। ছাপার বাসনা তথা উত্তেজনা নির্বাপিত হলো সম্পূর্ণ। তা কি সম্ভব আমার পক্ষে? এই বয়সেও যদি তা সম্ভব না হয়, তবে তা কবে হবে?...এই পথই আমার সামনে পড়ে রয়েছে একমাত্র পথ হিসেবে। নিজের সম্পর্কে মমত্ব বর্জন করার এই এক উপায়। এ কেবল এক আত্মপরীক্ষা চালানো। এক আধ্যাত্মিক অনুশীলন।’  
সম্প্রতি ৭০ বছরে পা রেখেছেন জয় গোস্বামী। ৭০ বছর বয়সে পৌঁছে কেন আর কবিতা প্রকাশ করবেন না এই কবি? তার ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন পুস্তিকায়। বলেছেন, ‘৫০ বছর ধরে আমার কবিতা ছাপা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কবিতা লেখা কি আমি শিখতে পেরেছি? নিজের কাছে কারচুপি করব না এই বয়সে। স্বীকার করে নেব—না, কবিতা কী করে লিখতে হয় আমি আজও শিখিনি। মুদ্রণ-উপযোগী কিছু লাইন “কবিতা”র নামে ছাপিয়েছি শুধু।’ নিজের কবিতা সম্পর্কে এমন  মন্তব্যের পর জয় গোস্বামী বলেন, এবার তিনি নিজের কাব্যভাষা খোঁজার চেষ্টা করবেন। তাই নিজেকে খোঁজার জন্য, নিজস্ব নিভৃতিতে বসে কাব্যরচনার প্রয়াস নেওয়ার সময় এখন তাঁর। লেখা প্রকাশের বাসনা থেকে নিবৃত্তি নিয়ে শুধু লেখার উত্তেজনাকে জাগিয়ে রাখা সম্ভব কি না, সেই নিরীক্ষায় তিনি প্রবেশ করতে চান।  
চারদিকে যখন আত্মপ্রকাশের উৎসব, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তথা ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, টিকটক আর ইনস্টাগ্রাম যখন হরদম উসকানি দিচ্ছে প্রকাশ্য হওয়ার, ঠিক তখনই প্রকাশের জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন জয় গোস্বামী।  
সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস ও আনন্দবাজার পত্রিকা  
গ্রন্থনা: অন্য আলো প্রতিবেদক

কখনো কখনো ধূসর কোনো ছবিতেই থাকে  
না দেখবার কারসাজি। আড়ালে আবডালে  
ব্যথা পুষতে গিয়ে পোষ মেনে যায় কারও কারও।  
অমলিন জ্যোৎস্নায় উৎসুক অতীত নিয়ে তাই  
রাতের কানাকানি থেকে যায় অবশেষে।  
দৈবাৎ কোনো পদাবলি এসে যদি টোকা দেয়  
বন্ধ দরজায়, যদি কোনো অন্ধ হোমার তুলে নেয়  
কাহিনি রচনার ভার; তাতে আমারও থাকে কিছু দায়।  
ভেলকিবাজির মতো ঘটে না কিছু নিত্য যাপনে  
মিথ্যে সংলাপে বকে যাওয়ার মতো সময় এখন।  
শেষ পর্যন্ত দেখা হয় না কিছু ভুলের মহড়া ছাড়া;  
কিছুটা অন্ধকারে ঢেকে যায় কিছুটা কুয়াশার কফিনে।

পাতলা চারতলা বাড়িটায়  
যাদের ঘর ছিল—  
মানে দুইটা কামরা  
বিছানা, একটা খাবার টেবিল  
ইতস্তত কিছু সোফা, ফ্রিজ, এটা-সেটা...  
ঘর হতে যা লাগে আরকি!  
তবু তো ঘর পাল্টায়,   
বদলায় ঘর;  
ঘরের মানুষেরা কেউ থাকে,   
কেউবা থাকে না কোথাও আর,  
চলে যায় দূর কোথাও, বহুদূরে...  
দূরে যাওয়ার সময় বাবা-মাকে  
এমন বুড়ো-বুড়ো লাগে কেন!

যে সকল রাত মা অনেক যত্ন করে লুকিয়ে রাখেন  
তার থেকে কিছু রাত চুরি করে বেড়ে উঠছি,  
আমাদের নেভি ব্লু বয়স লুকিয়ে রাখছি   
একটা অত্যাশ্চর্য নিমগাছের কাছে;  
ঝিনাইয়ের থেকেও বেশি পানি আমাদের চোখে  
মা একটা দুঃখিত ব্যাংক  
সেকেন্ড সেকেন্ড চোখের পানি জমা রাখছি   
মায়ের চোখে  
হাত মেলে, পাখা মেলে পাখিদের স্বপ্নে   
আমাদের অবাধ আনাগোনা  
চোখ মেলতে পারি না কোনোভাবেই  
বিধ্বস্ত বুকটা মেলতে পারি না  
বুকটাতে যে একটা সবুজ শিশু ঘুমিয়ে আছে—  
উন্মুক্ত করে দেখাতে পারি না তোমাদের  
রাতটাকে লিখে রাখছি মায়ের কুসুমিত কান্নায়।

কোনো কোনো দিন  
আপনাকে চিনি না,  
বলতে ইচ্ছা হয়   
আপনি আসলে কে?  
বলতে ইচ্ছা হয়   
আপনার ভেতরে   
আমার যে ছায়া  
রাখা আছে   
সেটা কোথায়?  
তাসেরও ছায়া পড়ে,  
দোভাষি দিনটা তখন  
ভুলে যায় বলতে   
কী ছিল কথার দাম...  
ছায়া বন্ধক রেখে   
আমি চলে যাই

এর নাম মুগ্ধতা, যদি তুমি বুঝে নিতে পারো  
সন্দেহ হয় যদি কালকেই আসব আবারও  
নতুনের মতো রোজ, কখনো হও না পুরোনো যে  
একবার (চোখ মেলে) দেখে যদি কেউ, মনে মনে  
তোমাকেই খোঁজে  
বিকেলের কার্নিশে ঝুলে আছে রোদটুকু (প্রায়শই   
এ রকম হয়), গলি থেকে বের হয়ে দাঁড়িয়েছো  
সড়কের নম্বর ৯  
রাস্তায়, রিকশায়, পোস্টারে, আলোয়, আঁধারে  
ফুটপাতে ডুবে যাই ক্ষুদ্র এ হৃদয়ের ভারে  
ঝিরিঝিরি বাতাসের রাতে তারাগুলো সন্ধ্যাপ্রদীপ  
তুমি আর কিছু নও, সোনা, তুমি শুধু (ছোট) লাল টিপ  
আর কিছু নও তুমি, চন্দ্রের তুমি এক ফোঁটা  
আমি লিখি বলে (আর কাউকেই লিখতে দেব না  
বিবরণ তোমার পুরোটা)

বন্দী শিবির থেকে কাব্যগ্রন্থের বেশির ভাগ কবিতা শামসুর রাহমান লিখেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সময়। মজলুব আদিব ছদ্মনামে তাঁর কবিতাগুলো সে সময় ছাপা হয়েছিল কলকাতার দেশ পত্রিকায়।  
এখন চরে না ট্যাংক ভাটপাড়া, ভার্সিটি পাড়ায়  
দাগে না কামান কেউ লক্ষ্য করে ছাত্রাবাস আর।  
এখন বন্দুক  
জানালার ভেতরে হঠাৎ  
দেয় না বাড়িয়ে গলা অন্ধকারে জীবনানন্দীয়  
উটের মতন। ফৌজি ট্রাক কিংবা জিপ  
রাস্তায় রাস্তায়  
পাগলা কুকুরের মতো দেয় না চক্কর। এখন তো  
হেলমেটকে মানুষের মস্তকের চেয়ে  
বেশি মূল্যবান বলে ভুলেও ভাবি না।  
 এখন বিজয়ানন্দে হাসছে আমার বাংলাদেশ  
লাল চেলি গায়ে, কী উদ্দাম। গমগমে  
রাস্তাগুলো সারাক্ষণ উজ্জ্বল বুদ্বুদময়। শুধু আপনাকে,  
হ্যাঁ, আপনাকে মুনীর ভাই,  
ডাইনে অথবা বাঁয়ে, কোথাও পাচ্ছি না খুঁজে আজ।  
আপনার গলার চিহ্নিত স্বর কেন  
এ শহরে প্রকাশ্য উৎসবে  
শুনতে পাব না আর? সেই চেনা স্বর? ঝরা পাতার ওপর  
খরগোশের মৃদু পদশব্দের মতন?  
আপনার মতো আরও কতিপয় মুখ  
চেনা মুখ আর  
এখানে যাবে না দেখা, যাবে না কখখনো।  
মনে পড়ে, জুনে জলে-ঘোলা পচা ডিমের বিশদ  
কুসুমের মতো এক ঘোলাটে বিকেলে  
এই শত্রুপ্লাবিত শহরে হলো দেখা  
আপনার সঙ্গে পথপার্শ্বে। দেখলাম,  
আপনি যেন বা সেই জলচর পাখি,  
ডাঙ্গায় চলতে গিয়ে ব্যর্থ,  
হোঁচটে হোঁচটে  
বিষম ক্ষতবিক্ষত, পরাজিত, দারুণ নিষ্প্রভ।  
আমাদের সবার জীবনে  
নেমেছে অকালসন্ধ্যা, হয়েছিল মনে,  
আপনার চোখে চোখ রেখে।  
তখন সে চোখে কবরের পরগাছার কী কর্কশ  
বিষণ তা আর হানাবাড়ির আঁধার  
লেপ্টে ছিল, বারুদের গন্ধ ছিল সত্তায় ছড়ানো।  
 ‘এই যে, কেমন আছ শামসুর রাহমান, তুমি?  
খবর আছে কি কিছু?’—যেন আপনারই ছায়া কোনো  
করল প্রশ্ন রক্তাক্ত প্রান্তরে। অসামান্য  
বাগ্মীও কেমন আর্ত হন, হায়, বাক্যের দুর্ভিক্ষে,  
বুঝেছি সেদিন।  
আপনার চোখে বুঝি ফুটেছে অজস্র বনফুল,  
নেমেছে জ্যোৎস্নার ঢল মুখের গহ্বরে, প্রজাপতি  
পেলব আসন পাতে বৃষ্টি ধোয়া ললাটের মাঠে,  
আপনাকে ঘিরে দৈনন্দিন  
ঘাস আর পোকামাকড়ের গেরস্থালি।  
আপনি মুনীর ভাই কুকুর কি শেয়ালের পায়ের ছাপের  
অন্তরালে ঢাকা পড়ে থাকবেন, হায়,  
কী করে আপস করি এমন ভীষণ অত্যাচারী  
ভাবনার সাথে?  
বলুন মুনীর ভাই, আপনি কি আগাছার কেউ?  
আপনি কি ক্রীড়াপরায়ণ প্রজাপতিটার কেউ?  
আপনি কি শেয়ালের? কুকুরের? ঘাসের? পিঁপড়ের?  
শকুনের? আপনি কি ক্রূর ঘাতকের?  
শুনুন মুনীর ভাই, আপনার বারান্দার নিভৃত বাগান  
কেমন উদ্গ্রীব হয়ে আছে গৃহস্বামীর প্রকৃত  
শুশ্রূষার লোভে আজও। একটি বিশুষ্ক ঠোঁট বৈধব্যের ঘাটে  
জেগে থাকে আপনার উষ্ণ চুম্বনের প্রতীক্ষায়,  
একটি টাইপরাইটার আপনার একান্ত স্পর্শের জন্যে  
নিঝুম নীরব হয়ে থাকে। ফের কবে  
পাতা উল্টাবেন বলে সকালে দুপুরে মধ্যরাতে  
পথ চেয়ে থাকে শেল্‌ফময় গ্রন্থাবলি  
আপনার পদধ্বনি আবার শুনবে বলে ঐ তো  
এখনো ফ্ল্যাটের সিঁড়ি কান পেতে রয় সারাক্ষণ। কোনো কোনো  
সভাগৃহ আপনার ভাষণের জন্যে আজও কেমন উৎকর্ণ  
হয়ে পড়ে। আপনার অভ্যস্ত ছায়ার জন্যে এখনো পড়ে না  
দর্পণের চোখের পলক।  
 ‘আছে কি খবর কিছু?’—আপনার ব্যাকুল জিজ্ঞাসা  
সাঁতরে বেড়ায় আজও আমার মগজে ক্ষান্তিহীন।  
কেলিপরায়ণ  
মাছের মতন কোনো সংবাদের লেজ ধরে সেদিন বিকেলে  
রক্তাক্ত প্রান্তরে  
আপনাকে পারিনি দেখাতে।  
অথচ এখন নানারঙা পাখি হয়ে ডেকে যায়  
খবরের ঝাঁক ইতস্তত। শুনুন মুনীর ভাই  
কালো জঙ্গি পায়ের তলায় চাপা পড়া  
আপনার ‘বাংলাদেশ লক্ষ লক্ষ বুটের চেয়েও  
বহু ক্রোশ বড়ো বলে বর্গীরা উধাও।’ বহুদিন  
পরে আজ আমাদের মাতৃভূমি হয়েছে স্বদেশ,  
ইত্যাদি ইত্যাদি  
খবর শুনুন।  
 শুনুন মুনীর ভাই, খবর শুনুন বলে আজ  
ছুটে যাই দি‌গ্‌বিদিক, কিন্তু কই কোথাও দেখি না আপনাকে।  
খুঁজছি ডাইনে বাঁয়ে, তন্ন তন্ন, সবদিকে, ডাকি  
প্রাণপণে বারবার। কোথাও আপনি নেই আর।  
আপনি নিজেই আজ কী দুঃসহ বিষণ্ন সংবাদ।  
...  
সূত্র: বন্দী শিবির থেকে, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৭২, প্রকাশক: অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে বাঙালিদের ওপর গণহত্যা শুরু করেছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। পরদিন ২৬ মার্চ ৭৭ নম্বর সামরিক আইনবিধিতে গণমাধ্যমের ওপর প্রেস সেন্সরশিপ আরোপ করে পাকিস্তানি সামরিক শাসকচক্র। যার মোদ্দাকথা হলো, সরকারিভাবে নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আগে পেশ না করে এবং কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র ছাড়া জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে যায়, এমন কোনো বিষয় প্রকাশ করা যাবে না। তাই অবরুদ্ধ বাংলায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে লেখালেখি সহজ ছিল না।  
তবে সেই কঠিন দুঃসময়ে কেউ কেউ লেখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে লেখা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব ছিল। ফলে মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের সপক্ষে পত্রপত্রিকায় লেখা পাঠালেও সেসব লেখা প্রকাশ করা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ছাপাতে না পারা এমনই তিনটি কবিতা ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি দৈনিক বাংলার ‘মহিলা মহল’ পাতায় প্রকাশিত হয়। (সরকারি এ সংবাদপত্রের আগের নাম ছিল দৈনিক পাকিস্তান। মুক্তিযুদ্ধের পর নাম পরিবর্তন করে পত্রিকাটি দৈনিক বাংলা নামে প্রকাশিত হয়)। দুজন নারীর লেখা কবিতাগুলোর ওপর লেখা হয় ‘যে লেখা ছাপতে পারিনি’। সেখানে কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা ও জরিনা আখতারের কবিতা ছিল। তবে এখানে এখন কেবল জরিনা আখতারের কবিতা ও সেই কবিতাসংক্রান্ত সাক্ষাৎকারই ছাপা হলো।  
জরিনা আখতারের কবিতা লেখা শুরু ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে, স্কুলছাত্রী থাকাকালে। পেশাগত জীবনে ঢাকার লালমাটিয়া মহিলা মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করে এখনো লেখালেখিতে সক্রিয় তিনি।  
তো ১৯৭১ সালে ‘সহমর্মিতা’ শিরোনামে জরিনা আখতার দৈনিক বাংলায় পাঠিয়েছিলেন দুটি কবিতা—‘বান্ধবীকে’ ও ‘দামাল কিশোর আজ’।  
এই কবিতায় পাকিস্তানি সেনাদের গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের কথা উঠে এসেছে। এর ভাষা, শব্দপ্রয়োগ ও ভাবার্থের দিকে খেয়াল করলে পাঠকমাত্রই বুঝতে পারবেন, কবিতাগুলো যুদ্ধকালে কেন প্রকাশিত হয়নি।  
কবিতা দুটিতে সমকালীন বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।  
জরিনা আখতার  
১. বান্ধবীকে  
শুনেছি তোমার ঘর নেই, এলোমেলো  
                        হয়ে গেছে সব;  
প্রিয় টেবিল, পুস্তক কোথায় বিলীন হলো।  
তোমার ঠিকানা লুকানো ছিল  
            মাধবীর ঝাড়ে,  
শ্বাপদের নখের মতো কোনো নখ  
            তোমার ঠিকানা তুলে নিল;  
বিক্ষত মাধবীর ঝড়ে পড়ে আছ,  
            তোমার ঠিকানা নেই।  
শুনবে আমার কথা।  
আমি ভালোই আছি, আমি যে সইতে জানি;  
 গোপন বেদিতে নিশিদিন বেদনার  
                        নিধনযজ্ঞ ঘটাই।  
যদি বেঁচে থাকো—  
আমার নামের অস্ত্র ধারণ করো নিউজপেপারের পৃষ্ঠা হতে।  
২. দামাল কিশোর আজ  
অশান্ত চোখ তুলে কি দেখছ কিশোর।  
লাটিম-ঘুড়ির স্তূপ জমে আছে  
            সবুজ ঘাসের বুকে;  
কাদার ভেতর হতে চকচকে মাছেরা এসে লুটায় তোমার পায়ের কাছে।  
কত দিন ডেকেছি তোমাকে,  
হে দামাল কিশোর, পালিয়েছ হেসে।  
আজ বড় কাছাকাছি এসে গেছ,  
লাটিম-ঘুড়িবর্জিত হাতে কি তুলেছ আজ।  
অশান্ত চোখ হাতে আমারই মতো  
                        কি ছড়াতে চাও।  
এসো হে কিশোর, আজ বধ্যভূমিতে  
                        দাঁড়াতে হবে।  
জরিনা আখতারের সাক্ষাৎকার  
প্রশ্ন: ‘বান্ধবীকে’ ও ‘দামাল কিশোর আজ’ কবিতা দুটি মুক্তিযুদ্ধকালে ঠিক কোন সময় লিখেছিলেন?  
উত্তর: কবিতা দুটো মুক্তিযুদ্ধকালে ঠিক কোন সময়ে লিখেছিলাম, তা মনে করতে পারছি না। তবে এইটুকু স্পষ্ট মনে আছে, স্বাধীনতার পরপরই আমার ওই কবিতা দৈনিক বাংলায় ‘যে কবিতা ছাপতে পারিনি’ শিরোনামে প্রকাশিত হয়। কিন্তু কবিতাগুলো তখন আমি সংরক্ষণ করতে পারিনি। ফলে হারিয়ে যায়।  
প্রশ্ন: আপনি তখন ঢাকায় ছিলেন?  
উত্তর: আমি ঢাকায়ই ছিলাম। থাকতাম আসাদ গেটসংলগ্ন একটি কলোনিতে, যেটিকে নিউ কলোনি বলা হতো। তখন এটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা। বিহারিদের আনাগোনা সব সময় লেগে থাকত। তারা নানা রকম ভয়ভীতি দেখাত।  
প্রশ্ন: ১৯৭১ সালে অবরুদ্ধ বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে লেখালেখি করা বেশ কঠিন ছিল। আর কবিতা লিখে সেটি ‘দৈনিক পাকিস্তান’-এ পাঠানো তো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।  
উত্তর: মুক্তিযুদ্ধের সময় অবরুদ্ধ ঢাকায় বসে কবিতা দুটো লেখা এবং তা পত্রিকায় পাঠানোর ব্যাপারটি ছিল মূলত আবেগের তাড়না। মূলত মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন এবং নিজেদের স্বাধীন ভূখণ্ডের স্বপ্নের সপক্ষে কবিতা দুটো লিখেছিলাম। পরে ডাকমারফত সে কবিতা পত্রিকায়ও পাঠিয়েছিলাম। তখন আমি অনার্স তৃতীয় বর্ষে পড়ি। আজ বুঝতে পারি, সেদিনের বাস্তবতায় কতটা অপরিণামদর্শী ছিল আমার এই পত্রিকায় পাঠানোর ব্যাপারটি। কিন্তু আমি গর্বিত যে স্বাধীনতার পক্ষে আমার কলম কথা বলেছিল।  
 ২০২২ সালের ২৯ নভেম্বর সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন বাশার খান

আপাতত স্থির হয়ে আছি। মুগ্ধতার নাতিদীর্ঘ  
হাওয়া পাতার মুঠোয় ভরে নিয়ে যাচ্ছে অন্য গ্রহে—  
অন্য কোনো মৌবনে। সমুদ্র, পাহাড় ও অন্তহীন  
পথ, তোলপাড় ঝড়ে মেলে রাখে পাগল আকাশ...  
আপাতত এই পথ মিলনরহিত, এই পথে  
কাঁটার বিন্যাস—সরে যায় হাওয়া, পথের ইঙ্গিত  
গন্তব্য নিশানা পেতে এই পথে যেতে হবে তবু।  
জ্বর-জরা পায়ে ঠেলে যেতে হবে অবিমৃশ্যতায়  
পাথর-বাগান ধরে যেতে হবে টলোমলো পায়ে  
যেতে হবে, যেতে হয় বুকে রেখে যত অনিশ্চয়  
অন্ধ হাতির যেমন ভয় থাকে—চোরা গিরিখাতে  
আগুনতৃষিত এই পথ টানে নিস্পৃহ হাপর  
যে গান পতিত হলো এই পথে তারও কিছু সুর  
মেঘের পকেটে বাজে—মনে হয় বৃষ্টি হচ্ছে দূরে!

কুঠার লুকাতে আমি জঙ্গলে ঢুকেছি কতবার  
আমাকে দেখিয়ে পথ, চলে গেছে কত জাগুয়ার  
আশ্রমের মতো ছিল, চেনা চেনা চারপাশ তবে—  
কোথাও নৈবেদ্য নেই, মানুষের চেনা অবয়বে  
ছিল না নীরব কোনো, ঘাতকের সমদর্শী মন—  
সিমারের ভালোবাসা পেয়েছিল মসীময় বন  
দেখেছি জলের মাঝে, মাছেরা করেছে ঢেউ চাষ  
বাতাসে বাতাসে হাসে, পাখিদের প্রাচীন আবাস  
আমাকে আপন ভেবে বুকে টেনে নিয়েছে পাহাড়  
কুঠার লুকাতে আমি জঙ্গলে ঢুকেছি যতবার।

উন্মাদনা থেমে গেলে  
নিরস্ত্র লোকটি মন খারাপ করে বসে আছে  
চায়ের দোকানের সামনের বেঞ্চিতে।  
 তার প্রতি আর কারও কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।  
 অথচ একটু আগে যখন রাজার নামে দিচ্ছিল গালি  
লোকেরা কতই না তালি, আমোদে মেতেছিল।  
 চ্যালা কাঠ হাতে তাড়া করলে পথিককে  
লোকেরা কতই না আদরে নিরস্ত্র করেছিল।  
ধুলো ছিটাতে চাইলে ফুটন্ত চায়ের পানিতে  
ভেঙে ফেলে চাইলে ক্যাশবাক্সের কাচ  
তবেই না দোকানি কলা-বনরুটি সেধেছিল।  
 এখন সে নিরস্ত্র।  
 পাগলামো থামিয়ে মন খারাপ করে বসে আছে  
খাবারের দোকানের সামনের বেঞ্চিতে।  
 তার প্রতি আর কারও কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।

ইচ্ছে হয়, দিব্য আত্মার বাইরে  
মৃত আত্মার কাছে ফিরে যাই।  
এখানে যে জলপাইগাছের নিচে  
ফুরফুরে একটা জীবন কাটিয়ে  
দেওয়ার কথা, তার চেয়ে তার  
কম সময়েই চলে যেতে হয়!  
প্রত্যেক দুঃখের একেকটা ঘরে  
জেগে থাকে শুধু স্বপ্নটাই, আর  
পড়ে থাকে মায়ার ভেতর ছায়া!  
তা সত্ত্বেও অস্ত্র তো মানুষ নয়,  
তা সত্ত্বেও ভূখণ্ড নয় স্বাধীনতা!  
তারপরও স্মৃতি থেকে ভেসে ওঠে  
রক্তাভ মুখ, মানুষের এতিম কণ্ঠ!  
স্বপ্নে যে শিশুদের চিৎকার শুনে  
আমাদের ঘুম ভাঙে প্রতিদিন,  
সেখানেই লুকিয়ে থাকে এক  
পালানো শান্তির গোলকধাঁধা!

টিলার ঢাল বেয়ে ওঠানামা অতটা সহজ নয়।  
নির্জনতার সংকেতে কত কিছু ঘটে যেতে পারে,  
তুমি তার কিছুই জানো না।  
চাঁদের ভগ্নাংশ কোনো দিকনির্দেশনা দেবে না,  
পরিপার্শ্ব কেবল ঘোলাটে করে তোলে।  
যা ঘটে তা শুধু পিছুটান।  
পাখিদের অভিসন্ধি দূরের পথে পথে ছড়িয়ে পড়েছে,  
তুমি তার বিন্দুমাত্র বুঝবে না।  
পায়ের পাতার নিচ থেকে উঠে আসবে শিরশিরানি।  
বাকিটা অন্যমনস্কতা, পরিত্যক্ত সাপের খোলস, মনস্তাপ,  
                   কবেকার ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক—  
সন্তপ্ত অসহায়তায় সবকিছু সয়ে যাওয়া—আর কিছু নয়।

রাত্রি জেগে চিঠি লেখা  
হলুদ খামের ভাঁজ,  
সহজ কথায় বুঝিয়ে দিতে  
মনের কারুকাজ।  
বুঝিয়ে দিতে চন্দ্রমুগ্ধ  
বনজোনাকির গানে,  
জোছনাগলা হাতের লেখায়  
ভালোবাসার মানে।  
একজীবনের সমীকরণ  
যেমন তুমি চাও,  
মনের মতো লিখে দিয়ো  
সময় যখন পাও।  
বুঝিয়ে দিতে লিখে দিয়ো  
তোমার সকল বেলা,  
হোক না আমি অল্প বুঝি  
তোমার মনের খেলা।